নারী আন্দোলন
(WOMEN'S MOVEMENT)

অনেক সমাজবিজ্ঞানী একথা মনে করেন যে ভারতবর্ষের নারী আন্দোলন সম্পর্কিত কোনো আলোচনা একমাত্রিক হওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। ভারতে সংঘটিত নারী অন্দোলনগুলির আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে। এদের প্রেক্ষাপট বা উদ্দেশ্যগুলিও অনেক ক্ষেত্রেই ভিন্ন রকমের। আবার অনেক সময়ই এই ধরণের আপাতভিন্ন নারী আন্দোলনগুলির মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণভাবে বেশ কিছু মিল ও যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়।

বিগত কয়েক শতাব্দী ধরেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিশেষ করে পাশ্চাত্যের নারীরা নারীর সমানাধিকারের সপক্ষে চিন্তাভাবনা এবং লেখালেখি শুরু করেন। কখনো কখনো নারী পুরুষ বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ অন্দোলনও সংঘটিত হতে দেখা যায়। নারী -পুরুষ বৈষম্যের বিভিন্ন কারণ বিশ্লেষণে সমাজে সর্বব্যাপী পিতৃতান্ত্রিকতা ও নারী অবদমনের ঘটনার মধ্যে স্পষ্ট যোগসূত্র খুঁজে পেয়েছেন অনেক সমাজবিজ্ঞানী এবং সমাজকর্মীরা। এই ধরণের বিশ্লেষণ প্রসূত আত্মজিজ্ঞাসাই মূর্ত হয়ে উঠেছে নারীর মানবাধিকারের দাবিতে, এসবের ভিত্তিতেই ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে নারী আন্দোলন বিশেষ করে ইউরোপ এবং আমেরিকায়। এরই প্রভাবে ভারতবর্ষেও নারী আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে।

তত্ত্বগতভাবে সিমোন দ্য বোভায়া (দি সেকেন্ড সেক্স, ১৯৪০) দেখান যে, পুরুষ-নারী পারস্পরিক সম্পর্কে নারীকে সবসময়ই দ্বিতীয় স্থানে থাকতে হয় কারণ সামাজিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে পুরুষকেই অগ্রবর্তী স্থানে বসানো হয়। এর স্বরূপ উপলব্ধি করতে গিয়ে তিনি বলেন -"মেয়ে হয়ে কেউ জন্মায় না, তারা মেয়ে হয়ে ওঠে। অর্থাৎ নারীকে 'নরেতর' করে তোলাই সামাজিকীকরণের লিঙ্গভিত্তিক রূপ। বহু বিশিষ্ট পশ্চিমী নারীবাদী তাত্ত্বিকরা আরও সহজ ও সুস্পষ্টভাবে নারীবাদের কার্যকরী সংজ্ঞা নির্ধারনের চেষ্টা করেছেন। তাঁদের মতে, পিতৃতান্ত্রিক শোষনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সংগ্রামেরই নাম -নারীবাদ। পশ্চিমের নারী আন্দোলন বিভিন্ন পর্যায়ে এই রাজনৈতিক সংগ্রামকেই আরও তীব্র করেছে।

Scanned with CamScanner

ভারতবর্ষে নারী আন্দোলনের প্রকৃতি ও পদ্ধতি নিয়ে সাধারণভাবে দুটি ভিন্ন মত আমরা প্রতিষ্ঠাপিত হতে দেখি।

একপক্ষের মতে, পিতৃতন্ত্র ও অর্থনৈতিক শোষণ এই দুইয়ের সমন্বিত আক্রমনে নারী শোষণের মাত্রা অনেক বেশি ভয়াবহ আকার ধারণ করে। মজুরীহীন শ্রম নারীশোষণের পূর্বশর্ত তৈরি করে, সেই কারণে শুধু লিঙ্গবৈষম্যের কথা বললে চলবে না। দারিদ্র্য ও আর্থিক বৈষম্যের সামগ্রিক পরিপ্রেক্ষিতে নারী বৈষম্যকে দেখতে হবে। বৃহত্তর অর্থনৈতিক আন্দোলনের সাথে নারী অন্দোলনকে যুক্ত করতে হবে। এই ব্যাপকতর আন্দোলনের অংশ হয়েই নারীদের বিশেষ স্বার্থ রক্ষা করা সম্ভব। অন্যপক্ষ, নারীর সমস্যা ও আন্দোলন সম্পর্কে ভিন্ন মত পোষণ করে। তাঁদের মতে, বৃহত্তর আন্দোলনে যুক্ত হতে গেলে এবং মানসিকভাবে সেই আন্দোলনের উপযুক্ত হতে গেলে তার উপযোগী পরিবেশ তৈরি করা প্রয়োজন। নারীর নিজস্ব সমস্যার সমাধান না হলে তাদের নিয়ে ব্যাপক আন্দোলনের কথা বলা অর্থহীন। এঁদের মতে, নারী শোষিত হয় নারী বলেই, জাত, বর্ণ, ধর্ম, শ্রেণি নির্বিশেষে একথা সত্যি। সেই কারনে এই সব ক্ষেত্রেই নারীর সমানাধিকারের মানসিকতা গড়ে তোলা প্রয়োজন। তাছাড়া তাদের মানসিকতা বৃহত্তর আন্দোলনের যোগ্য হয়ে উঠতে পারবে না।

ভারতে সংস্কার আন্দোলন ও নারী

ভারতীয় সমাজে পাশ্চাত্যের প্রভাব এবং নবজাগরণকে বাদ দিয়ে ভারতে নারী আন্দোলনের ধারাকে বোঝা খুব কঠিন।

অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিশিষ্ট কিছু পুরুষ সংস্কারকদের উদ্যোগে নারীর মর্যাদা ও অধিকার সুরক্ষার লক্ষ্যে সংস্কার অন্দোলন শুরু হয়েছিল। এর মূল কর্ণধার ছিলেন দেশের দুই মহান ব্যাক্তিত্ব— রাজা রামমোহন রায় এবং ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর। রাজা রামমোহন রায়ের প্রচেষ্টায় ১৮২৯ সালে আইনানুগভাবে সতীদাহপ্রথা রদ হয়। ১৮৫৬ সালে বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ আইন প্রণয়ণে ভূমিকা গ্রহণ করেন। রাজা রামমোহন এবং তার অনুগামীরা বহুবিবাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন। পাশাপাশি তাঁর নেতৃত্বে সম্পত্তিতে নারীর অধিকারের দাবীতেও আন্দোলন হয়। বিদ্যাসাগর বাল্যবিবাহ প্রথা রোধ করার চেষ্টা করেন। নারীশিক্ষা প্রসারে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অক্লান্ত প্রচেষ্টা পরবর্তী সময়ে ভারতবর্ষে নারী আন্দোলন বিকাশের ভিত্তিভূমি হিসেবে কাজ করেছে। তবে, অধ্যাপক সুমিত সরকারের মতে, সেই সময়কার সমাজসংস্কারকদের মধ্যে নারী-স্বাধীনতা' বিষয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছিল। তাঁর মূলত 'সীমাবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত নারী-স্বাধীনতার কথাই ভেবেছিলেন। গৃহের বাইরে কর্মক্ষেত্রে নারীর উপস্থিতিকে তাঁরা সমর্থন করেননি। গৃহকোণে নারীর শান্ত, কল্যাণী, সতী ও পতিব্রতা এবং সর্বোপরি

Scanned with CamScanner

'মাতৃ' রূপের সনাতনী ধারনাতেই তাঁদের আস্থা ছিল। তাঁরা শিক্ষিত সহধর্মিনী চেয়েছিলেন, কিন্তু মুক্তমনা স্বাবলম্বী নারীর কথা ভাবেননি। এটাও যে এক ধরণের নারী অবদমন তা তাদের মনে হয়নি বরং একটা স্বাভাবিক বিষয় হিসেবেই প্রতিভাত হয়েছে। তার ফলে, এই 'সীমায়িত ও নিয়ন্ত্রিত' নারী স্বাধীনতাকে মহিমান্বিত করার প্রয়াসও ভারতীয় সমাজে পরিলক্ষিত হয়েছে।

নারীবাদী তাত্ত্বিকদের মতে, এই কারণে পরবর্তী কালে নারী সংগঠকদের নেতৃত্বে ভারতবর্ষের নারী আন্দোলনে 'সীমাবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত নারী স্বাধীনতার' সংস্কারবাদী ধারণার বিরুদ্ধেও সোচ্চার হতে হয়েছিল।

নারী-শিক্ষা প্রসারে ব্রাহ্মসমাজ, আর্যসমাজ ও প্রার্থনা সমাজের ভূমিকার কথাও উল্লেখ করা যায়। তবে এই সব সংস্কারপন্থী সংগঠনগুলিও কমবেশি সনাতনী মূল্যবোধে বিশ্বাসী ছিল। এদেরও ভাবনায় ছিল নারী শিক্ষা ও স্বাধীনতার সংকোচিত রূপ।

সামগ্রিকভাবে একথা বলা যায় যে উনিশ শতকের সংস্কার আন্দোলন পরোক্ষভাবে হলেও ভারতের নারী আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করলো শিক্ষিত, স্বাধীনচেতা ও যুক্তিবাদী কিছু 'নারীকণ্ঠ' উপহার দেবার মধ্য দিয়ে।

জাতীয়তাবাদ ও ভারতের নারী-আন্দোলন

জাতীয়তাবাদ ভারতীয় নারীদের বৃহত্তর রাজনৈতিক আন্দোলনে যুক্ত হবার ক্ষেত্র ও স্পৃহা - দুটোই অনেক গুন বাড়িয়ে দিয়েছিল। অধ্যাপক এ. আর. দেশাই'র মতে, সেইসময়কার ভারতবর্ষের ইতিহাসে অন্যতম বিস্ময়কর ঘটনা হলো রাজনীতির আঙিনায় ভারতীয় নারীদের দ্রুত প্রবেশ। প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতবর্ষে সুলতানা রাজিয়া, চাঁদ বিবি, নূরজাহান, অহল্যাবাঈ হোলকার -এর মতন রাজকীয় এবং অভিজাত পরিবারগুলির অল্পকিছু মহিলা ছাড়া সাধারণ ও মধ্যবিত্ত নারীরা কখনো রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেনি। জাতীয়তাবাদের ঢেউ এই অবস্থাকে আমূল পাল্টে দিল। যে সীমিত ভোটাধিকার সে সময় নারীরা পেয়েছিল সেটাতো তারা ব্যবহার করেই ছিল এমনকী গণআন্দোলনেও তারা অংশগ্রহণ করেছিল। দেশাই -এর বক্তব্য অনুযায়ী, সেই সময় শত শত নারী রাজনৈতিক গণআন্দোলনে অংশ নিচ্ছে, মদের দোকান তুলে দেবার দাবিতে পিকেট করছে, মিছিলে হাঁটছে, জেল খাটছে, লাঠি-গুলির মুখোমুখি হচ্ছে-এ এক অভিনব ব্যাপার। এইভাবে বড় বড় রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে এক উল্লেখযোগ্য সংখ্যার ভারতীয় নারী পিতৃ কর্তৃত্বের নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে পরিবারের গৃহকোণ থেকে বেড়িয়ে বাইরের বৃহত্তর কর্মকান্ডের শরিক হলো। দেশের নাগরিক হিসেবে তাদের পরিচিতি হলো। ভারতীয় নারীর জীবনে একটা বড় ধরণের পরিবর্তন এলো। সনাতনী ভারতীয় সমাজের যুগসঞ্চিত বাধানিষেধ অনেকটাই ভেঙ্গে পড়ল।

Scanned with CamScanner

কোনো কোনো সমাজবিজ্ঞানীর মতে, মহাত্মা গান্ধী নারীবাদী আন্দোলনের বৈশিষ্ট্যগুলিকে সমগ্র জাতীয় আন্দোলনের সাথে যুক্ত করতে পেরেছিলেন। তার ফলে বিপুল সংখ্যক নারী এবং নারী-গোষ্ঠীকে তিনি এই আন্দোলনে সামিল করতে সমর্থ হয়েছিলেন। অসহযোগ আন্দোলন এবং ১৯৩০ সালের লবন সত্যাগ্রহে বহু নারীকে মিছিল করতে এবং পিকেটিং-এ যোগ দিতে দেখা যায়। আন্দোলনকারীদের দাবি যে সমগ্র নারী সমাজই এই অন্দোলনগুলিতে অংশ নিয়েছিলেন কিন্তু বাস্তবে উচ্চ শ্রেণির ও মধ্যবিত্ত মহিলাদের সংখ্যাই ছিল বেশি। উদাহরণ হিসেবে আমরা পাঁচজন মহিলার নাম উল্লেখ করতে পারি। এঁরা হলেন, কাদম্বিনী গাঙ্গুলী, স্বর্ণকুমারী ঘোষাল, পন্ডিতা রামাবাঈ, বিদ্যা গৌরী নীলকণ্ঠ এবং শ্রীমতী নিকম্বা। ১৮৮৯ সালে বোম্বেতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে এঁরা প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করেছিলেন। এছাড়াও, সরোজিনী নাইডু, অ্যানি বেসান্ত, কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়, বিজয়লক্ষী পন্ডিতদের মতন অনেকে নেত্রী হিসেবে আন্তর্জাতিক খ্যাতিও লাভ করেছিলেন। 'হোম-রুল' আন্দোলনের নেত্রী অ্যানি বেসান্ত ১৯১৭ সালে কংগ্রেসের সভানেত্রী হন। সরোজিনী নাইডুও ১৯৫২ সালে কংগ্রেস সভানেত্রী নির্বাচিত হন। তিনি বিভিন্ন প্রদেশের চোদ্দোজন প্রতিনিধি নিয়ে মন্টেগু চেমস্‌ফোর্ড মিশনের কাজে ডেপুটেশন দেন। তাঁদের দাবিগুলির মধ্যে ছিল মহিলাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও মাতৃকল্যান সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়। এছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ ছিল সমান ভোটাধিকারের দাবি। এই সংগঠিত জনমতের চাপেই ১৯২৯ সালে প্রতিটি প্রাদেশিক আইন সভা ভারতীয় মহিলাদেরও পুরুষদের সমান ভোটাধিকার দিয়ে প্রস্তাব পাস করে। ভারতের নারী স্বাধীনতার সপক্ষে এই বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

অধ্যাপক এ. আর. দেশাই এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন যে ভারতবর্ষে নারীর রাজনৈতিক আন্দোলন শুধুমাত্র উচ্চ ও মধ্যবিত্ত স্তরেই সীমিত না থেকে দ্রুতই নিম্নতর শ্রেণির নারীদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ল। এই শ্রেণির নারীরা তাদের নিরক্ষরতা ও অন্যান্য বাধা সত্ত্বেও ক্রমশই অনেকবেশি করে অধিকার সচেতন হচ্ছিল। শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণির হাজার হাজার নারী ধর্মঘট, সংগ্রাম, পথ বিক্ষোভ এবং সভা-সমিতিতে অংশগ্রহণ করছিল। জাতীয় রাজনৈতিক সংগঠনের পাশাপাশি বিভিন্ন কৃষক সংগঠন, শ্রমিক সংগঠন, নারী সংগঠনেও সক্রিয় ভাবে যুক্ত হচ্ছিল।

সেই সময়কার নারী আন্দোলনের কোনো কোনো নেত্রীর মনে হল, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অংশ হয়ে নারী অধিকারের লক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচি গুলি আশানুরূপ গুরুত্ব লাভ করতে পারবে না। এই জন্য প্রয়োজন নারীর সম্পূর্ণ নিজস্ব সংগঠন। জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশ নেওয়ার পাশাপাশি এই ধরণের সংগঠন গড়ে তুলে নারী-বৈষম্যের বিরুদ্ধে আন্দোলনকেও শক্তিশালী করে তোলা দরকার। এই ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিলেন সরলা

Scanned with CamScanner

দেবী চৌধুরাণী এবং রমাবাঈ। ১৯১০-১১ সালে তাঁরা 'ভারত স্ত্রী মহামন্ডল' নামে এক নারী সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর পরপর তৈরি হল— ১৯১৭ সালে উইমেন্স ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, ১৯২৫-এ ন্যাশনাল কাউনসিল অফ ইন্ডিয়ান উইমেন এবং ১৯২৭-এ অল ইন্ডিয়া উইমেন্স কনফারেন্স। উচ্চ বর্গের মহিলারাই এই সর্বভারতীয় সংগঠন গুলির নেতৃত্বে থাকলেও নিম্নবর্গের মহিলাদের দাবিগুলি এদের সংগঠনের কর্মসূচিগুলির অন্তর্ভুক্ত হয়।

সারদা আইন (১৯২৯-৩১) সংক্রান্ত বিতর্ককে ভিত্তি করে ১৯৩০-এর দশকেই ভারতবর্ষে নারী আন্দোলন বেশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ভিন্ন ভাষাভাষী, সম্প্রদায়, পেশার নারীরা ঐক্যবদ্ধ ভাবে এই আইনের বিরোধিতায় নামে। প্রায় এই সময়কালেই বামপন্থী মনোভাবাপন্ন শ্রমিক সংগঠন গুলিতে নারী শ্রমিকদের সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে দেখা যায়। বিশেষ করে বোম্বাই ও কলকাতার শ্রমিক সংগঠন গুলিতে নারী শ্রমিকদের আহ্বানে ১৯৩০-এর দশকে শ্রমিক ধর্মঘট সংঘটিত করতে দেখা যায়।

১৯৩০ সালে চরমপন্থী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনেও মহিলাদের ভূমিকা ছিল যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ও কল্পনা দত্ত'র ১৯৩১ সালে চট্টগ্রামে ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণের পরিকল্পনায় সামিল হবার কথা ছিল। এলাকা পর্যবেক্ষন করতে গিয়ে কল্পনা দত্ত গ্রেপ্তার হন। এছাড়াও সুনীতি দত্ত, বীনা দাস প্রমুখের নাম আমরা করতে পারি। ১৯৩০-এর আইন অমান্য অন্দোলনেও মহিলাদের ভূমিকা ছিল চোখে পড়ার মতো। তারা নিজস্ব সমিতি গুলির মধ্যেই আলাদাভাবে দেশাত্মবোধক গোষ্ঠী গড়ে তোলেন। যার নাম দেওয়া হয় 'দেশ সেবিকা সংঘ'। "মুক্তমনা বাড়ি এবং রক্ষণশীল পরিবার, শহুরে কেন্দ্র এবং গ্রামীন জেলা থেকে; মহিলারা -অবিবাহিত এবং বিবাহিত, যুবতী এবং বয়স্ক নির্বিশেষে এগিয়ে এসে যোগ দেন ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে এই সংগ্রামে।" (ফোর্বস, ২০০৫)

স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে নারী আন্দোলন

উন্নয়ন সংক্রান্ত সব ধরণের তাত্ত্বিক আলোচনাতেই একথা স্বীকার করা হয় যে দেশের সার্বিক কল্যান ও উন্নয়নের জন্য লিঙ্গসাম্য ও নারীর ক্ষমতায়ন আবশ্যক। প্রকৃতিগত ভাবে দেশের জনসংখ্যার অর্ধেক হচ্ছে কন্যা সন্তান। এরা মযার্দা. সমানাধিকার, ক্ষমতা না পেলে কোনো দেশ, সমাজ, পরিবার অগ্রসর হতে পারেনা। ভারতবর্ষের সংবিধান প্রনেতারা এই মতে বিশ্বাস করতেন। বি. আর. আম্বেদকর -এর লক্ষ্য ছিল সংবিধানভুক্ত আইনের মাধ্যমে নারীর সমানাধিকার কে স্বীকৃতি দেওয়া। খন্ডিত ও গৌণ সামাজিক পরিচিতি নয় তাঁর লক্ষ্য ছিল সম্পূর্ণ মানুষ পরিচয় যুক্ত নারী জীবন। ভারতের সংবিধান পুরুষ ও নারীকে সমান অধিকার দিয়েছে। মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত ১৪নং ধারায় বলা হয়েছে -রাষ্ট্র সব নাগরিককে আইনি

Scanned with CamScanner

নিরপত্তা লাভের সমান সুযোগ দেবে। ১৫নং ধারায় বলা হয়েছে, লিঙ্গের ভিত্তিতে রাষ্ট্র কোনো নাগরিকের প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করবে না। এই একই ধারার তৃতীয় অনুচ্ছেদে বলা আছে নারী ও শিশুর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে। অর্থাৎ এর দ্বারা মহিলাদের সপক্ষে বা সুবিধার্থে বৈষম্য মূলক পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শনের সংস্থান রাখা হলো। ১৬ নং ধারায় বলা হয়েছে, সরকারি ক্ষেত্রে নিয়োগের ব্যাপারে লিঙ্গের ভিত্তিতে কোনো ধরণের পক্ষপাতিত্ব করা যাবে না। ৪২ নং ধারা অনুযায়ী, কাজের ক্ষেত্রে মেয়েদের মানসিক ও ন্যায় সঙ্গত পরিবেশ এবং মাতৃত্বকালীন সবরকম সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে।

স্বাধীনতা লাভের পর ভারতবর্ষের পরিবর্তিত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে নারী আন্দোলন অনেকাংশে স্তিমিত হয়ে পড়ে। ভারতবর্ষের সংবিধানে নারীর সমানাধিকার আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিশেষ অধিকারের নিশ্চয়তা দিয়ে বিভিন্ন ধারা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে যুক্ত থাকা নারী-আন্দোলনের অধিকাংশ নেত্রী স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্র ও সংবিধানের প্রতি যথেষ্ট মাত্রায় আস্থাশীল ছিলেন। তার ফলে সেই সময় ভারতে নারী আন্দোলন মুখী কাজকর্মে সামগ্রিক ভাবে নির্লিপ্ততা দেখা যায়। নারী সংগঠনগুলির সমাজ কল্যান মুখী কর্মকান্ড বৃদ্ধি পায়। স্বাধীন ভারতবর্ষে রাজনৈতিক দলগুলির গণসংগঠন হিসেবে মহিলা শাখাগুলি মূল রাজনৈতিক দলের প্রভাব ও পরামর্শে কিছু কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করতে থাকে। স্বাধীনতার পরবর্তী কালে তেভাগা আন্দোলন, খাদ্য আন্দোলন, নকসালপন্থী আন্দোলনে বহু নারীকে অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়।

১৯৭০-এর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে ভারতের নারী আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটল। রাষ্ট্রসংঘ ১৯৭৫ সালকে বিশ্ব নারীবর্ষ হিসাবে এবং ১৯৭৫-৮৫ কে আন্তর্জাতিক নারীদশক হিসেবে ঘোষণা করে। এই ঘোষনা ভারতের নারী আন্দোলনকেও প্রভাবিত করেছিল। রাষ্ট্র সংঘের অনুরোধে নারীদশক পালনের প্রাক্কালে ভারত সরকার নিয়োজিত 'স্ট্যাটাস অফ উইমেন কমিটি' দেশের মেয়েদের অবস্থা নিয়ে গবেষণা করে। তারই ভিত্তিতে ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত হয় 'সাম্যের পথে' (Towards Equality) প্রতিবেদন। বিভিন্ন সাংবিধানিক সুরক্ষাব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও ভারতীয় নারীদের অধিকাংশের করুণ ও প্রান্তিক অবস্থা সবার গোচরে আসে। পিতৃতন্ত্র, উচ্চবর্গের আধিপত্যের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা শুরু হয়। মনে করা হয়, পিতৃতান্ত্রিক চিন্তাভাবনাই আধুনিকায়ন প্রক্রিয়া থেকে নারীদের আলাদা করে রাখছে, তাদের কর্মশক্তির বাইরে রাখা হচ্ছে, এমনকী কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারীরা পুরুষের সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। ভারতীয় সমাজে নারীর প্রতি বৈষম্যের একটা ঐতিহ্যগত প্রবনতা লক্ষ্য করা গেছে। বিশেষ করে, বিবাহ, মাতৃত্ব, গর্ভপাত, নারীর বিরুদ্ধে অপরাধ, সম্পত্তির উত্তরাধিকার, ইত্যাদি বিষয় গুলিতে। এরই ফলে ভারতীয় সমাজে

Scanned with CamScanner

লিঙ্গ স্তরবিন্যাস স্পষ্টভাবে গড়ে উঠেছে। ১৯৭৪ সালে হায়দ্রাবাদের প্রোগেসিভ অর্গানাইজেশন অব উইমেন' লিঙ্গ -অবদমন বিষয়ে জোরদার প্রচার ও পণ-প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলে। ১৯৭৩-৭৪ সালে সংগঠিত চরমপন্থী নারী সংগঠন গুলি শ্রেণি আধিপত্য এবং পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে তীব্রভাবে সমালোচনামূলক প্রচার শুরু করে। পুনে এবং বোম্বাইতে এই সংগঠন গুলির আয়োজনে ১৯৭৫ সালের ৮ই মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করা হয়।

১৯৭৫ সালেই মহারাষ্ট্রে নারী সমানাধিকারের লক্ষ্যে 'লীগ অফ উইমেন সোলজারস ফর ইক্যুয়ালিটি' নামে দলিত মহিলাদের একটি সংগঠন তৈরি করা হয়। জাত ও ধর্মের নামে যৌন নির্যাতনের বিরুদ্ধেও তারা সোচ্চার হয়। এরও তিনবছর আগে ১৯৭২ সালে মহারাষ্ট্রের ধুলিয়া জেলায় ভূমিহীন ভিল মহিলারা গড়ে তোলে শহদা (Shahada) আন্দোলন। এরা ঐ অঞ্চলে গার্হস্থ্য হিংসার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে তোলে।

রাধা কুমার'র মতে, ১৯৭০-এর দশকে সংঘটিত মহারাষ্ট্রের শহদা এবং মূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলন, গুজরাটে SEWA (Self Employed Women's Association) এবং নব নির্মাণ (Nava Nirman) প্রভৃতি অন্দোলন লিঙ্গ ভিত্তিক ইস্যুকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। গার্হস্থ্য হিংসা, নারী নির্যাতন, পণপ্রথা, মাদকাসক্তি যেমন আন্দোলনের ইস্যু ছিল পাশাপাশি মহিলা কর্মিদের কম মজুরি, অস্বাস্থ্যকর কাজের পরিবেশ, ইত্যাদির মতো বিষয়ও আন্দোলনের বিষয় হিসেবে উঠে এসেছিল। তবে ১৯৭৪ সালের নব নির্মান আন্দোলন মুলত মধ্যবিত্ত মহিলাদের দ্বারাই সংগঠিত হয়েছিল। রাধা কুমার-এর মতে ১৯৭০-এর দশকের এই ধরনের আন্দোলন গুলিকে 'স্বশাসিত মহিলা আন্দোলন' (autonomous women's movements) হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

১৯৭০ এর দশকে নারী আন্দোলনকারীদের দ্বারা সংগঠিত বেশ কিছু গণ আন্দোলন দেখতে পাওয়া যায় যার উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি অনেক ক্ষেত্রেই ভিন্ন ছিল। উদাহরণ হিসেবে আমরা চিপকো আন্দোলনের কথা বলতে পারি। 'চিপকো' শব্দের অর্থ হলো জড়িয়ে ধরা বা আলিঙ্গন করা। উত্তর প্রদেশের চামোলি অঞ্চলের গোপেশ্বরের কাছে মন্ডল নামক পাহাড়ি গ্রামে ১৯৭৩ সালে এই অহিংস আন্দোলন শুরু হয়। বন দফতরের কাছ থেকে ইজারা নিয়ে এই অঞ্চলের বিশাল বিশাল গাছ কয়েকটি শিল্প সংস্থা কেটে নিচ্ছিল। গ্রামের মানুষকে সুন্দরলাল বহুগুনার মতো পরিবেশবাদীরা তাদের জীবনে এর ভয়ানক কুফল সম্পর্কে সচেতন করতে সফল হন। এরপর গাছ কাটার বিরুদ্ধে গ্রামবাসী মহিলারা প্রতিটি গাছকে জড়িয়ে ধরে থাকত। মহিলাদের এই ধরনের প্রতিবাদ সংগঠিত রূপ নেয়। আদিবাসী মহিলারা প্রয়োজনে রাত জেগে গাছ পাহারা দিতেন। সরকার চিপকো আন্দোলনের যৌক্তিকতা স্বীকার করে নেন। বিশ্ব পরিবেশ আন্দোলনে চিপকো আন্দোলন খুবই গরত্ব লাভ করে। কমদ শর্মার মতে,

Scanned with CamScanner

...এর আন্দোলন যদিও প্রত্যক্ষভাবে নারী বৈষম্যের ইস্যুতে সংঘটিত হয়নি। তবুও এর প্রকৃতি ও পদ্ধতির কারণে একে নারীবাদী আন্দোলন হিসেবেই চিহ্নিত করা যায়।

১৯৭০'র দশকে উদারপন্থী, বামপন্থী ও চরমপন্থী এই তিন ধারার নারীবাদী আন্দোলন সংগঠিত হতে দেখা যায়। উদারপন্থীরা সংস্কারমূলক পদ্ধতিতে আইনি সংস্কারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। বামপন্থীদের লক্ষ্য মৌলিক সমাজ পরিবর্তন আর চরমপন্থী নারীবাদীরা পিতৃতান্ত্রিক সমাজের প্রেক্ষিতে নারী অবদমনকে বিশ্লেষণ করেন। এই সময়কালে প্রাতিষ্ঠানিক আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে নারীবাদ, নারীর অধিকার, নারী আন্দোলন। বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং পরবর্তী কালে মহাবিদ্যালয়ে গড়ে ওঠে মানবীবিদ্যা চর্চা কেন্দ্র। ১৯৮০-র দশকে ভারতবর্ষে বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নারী আন্দোলনের ক্ষেত্র আরও প্রসারিত হতে শুরু করে।

নারী সংগঠনগুলি থেকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে আইনি সহায়তা কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়। লজ্জা বা হিংস্রতার কারণে ধর্ষিতা ও নির্যাতিতা নারীদের খুব কম পারিশ্রমিকে বা একেবারে পারিশ্রমিক ছাড়াই আইনি পরামর্শ ও সহায়তা দেওয়া শুরু হয়। বিশেষ করে খুব দরিদ্র বা দুস্থ মহিলাদের মহিলা আইনজীবিরা প্রয়োজনীয় আইনি পরামর্শ দেওয়ার কাজ শুরু করে। যদিও নারীবাদী তাত্ত্বিক ফ্লাভিয়া অ্যাগনেসের মতে, নারীজীবনে বিভিন্ন আইনের প্রভাব খুবই সামান্য।

এই সময়কালে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য ১৯৮৫ সালের শাহবানু মামলা। এই মামলাকে কেন্দ্র করে ধর্মীয় ব্যক্তিগত আইনের বিষয়টি ভারতের নারী আন্দোলনকে যথেষ্ট মাত্রায় প্রভাবিত করে। শাহবানু নামের এক মুসলিম বিবাহ-বিচ্ছিন্না মহিলা তার প্রাক্তন স্বামীর কাছ থেকে খোরপোষ দাবি করে। সুপ্রিম কোর্টের মাননীয় প্রধান বিচারপতি শাহবানুর পক্ষে রায় দেন। এই রায়ের বিরোধিতায় সরব হয় মুসলিম মৌলবাদী সংগঠনগুলি। বিচারপতির রায় সামগ্রিক ভাবে মুসলিম ব্যক্তিগত আইনের বিরুদ্ধে ছিল। তিনি অভিন্ন সামাজিক বিধি (Uniform Civil Code) প্রণয়নের পক্ষে মতামত দিয়েছিলেন। ভারতবর্ষের অধিকাংশ নারী সংগঠন শাহবানু মামলার ঐতিহাসিক রায়কে স্বাগত জানায়। নারী সংগঠনগুলির দাবি উপেক্ষা করে মুসলিম পিতৃতান্ত্রিক সমাজের চাপে তৎকালীন কেন্দ্রিয় সরকার এই রায়কে নিষ্ক্রিয় করতে ১৯৮৬ সালে মুসলিম নারী আইন (বিবাহ বিচ্ছেদে অধিকার সুরক্ষা) রূপায়িত করে।

নারী সংগঠনগুলিও অভিন্ন সামাজিক বিধির (Uniform Civil Code) পক্ষে দেশব্যাপী প্রচার শুরু করে। এরই পাশাপাশি ভারতীয় মুসলিম মহিলা আন্দোলন (BMMA) তিন তালাক প্রথা বাতিলের দাবিতে প্রচার ও আন্দোলন শুরু করে। এর বিরুদ্ধে জনমত গঠনের লক্ষ্যে সই সংগ্রহ শুরু হয়। সচেতনতা বৃদ্ধির প্রচারে সাহায্য করার জন্য জাতীয়

Scanned with CamScanner

মহিলা কমিশনের কাছেও আর্জি জানানো হয়। লক্ষাধিক স্বাক্ষর সংগৃহিত হয়। সায়রা বানু এবং অন্য কয়েকজন মুসলিম মহিলা তিন তালাক প্রথা বাতিলের জন্য আদালতে পিটিসন করেন। অল ইন্ডিয়া মুসলিম পারসোনাল ল বোর্ড এই প্রথার পক্ষে আদালতে এফিডেভিট জমা দেয়। ২০০৫ সালে মুসলিম মহিলারাও অল ইন্ডিয়া মুসলিম উইমেন্স পারসোনাল ল বোর্ড' গঠন করে। 'তিন তালাকের' পক্ষে বিপক্ষে জোরদার প্রচার ও আইনি লড়াই শুরু হয়। ১৯৮৫ সালের শাহবানু মামলার ক্ষেত্রে মুসলিম মহিলাদের এতটা সক্রিয় বা সংগঠিত হতে দেখা যায়নি।

কেন্দ্রিয় সরকার ২০১৭ সালের ১১মে সর্বোচ্চ আদালতে তিন তালাক প্রথার বিরুদ্ধে তাদের মতামত জানায়। ২০১৭ সালের অগাস্ট মাসে সুপ্রিম কোর্ট 'তিন তালাক' বা তালাক-ই-বিদ্দৎ কে অসাংবিধানিক আখ্যা দিয়ে এর উপর ছয় মাসের নিষেধাজ্ঞা জারি করে কেন্দ্রীয় সরকারকে ঐ সময়কালের মধ্যে এ বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে নির্দেশ দেয়। কেন্দ্রিয় সরকার ২০১৭ সালের ২৮শে ডিসেম্বর লোকসভায় 'দি মুসলিম উইমেন (প্রোটেকশান অফ রাইটস অন ম্যারেজ) বিল পাস করে তাৎক্ষনিক তিন তালাককে (talaq-e-biddat) বাতিল ঘোষনা করে। এর ফলে মুসলিম মহিলাদের সমানাধিকারের দাবিতে দীর্ঘ আইনি লড়াই সাফল্যের মুখ দেখে।

নারী আন্দোলনের তাত্ত্বিকদের ও কর্মিদের পিতৃতান্ত্রিক সমাজের নেতিবাচক দিকগুলি নিয়ে নিরন্তর বিশ্লেষণ ও প্রচার নারী অবদমনের বিভিন্ন দিকগুলি তুলে ধরছে। এর ফলে সরকার প্রয়োজন অনুভব করেছে নতুন নতুন আইন রূপায়ন করার। পারিবারিক হিংসা থেকে নারীকে রক্ষা করার লক্ষ্যে এমনই একটি উল্লেখযোগ্য আইন 'প্রোটেকশন অফ উইমেন ফ্রম ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স অ্যাক্ট,' ২০০৫। এর আগে, বিবাহ-বিচ্ছেদের বিচার প্রক্রিয়া চলাকালীন সময়ের মধ্যে নির্যাতনকারী আরও নির্যাতনের সুযোগ পেয়ে যেত। এই কারণেই ভয় পেয়ে বেশির ভাগ মহিলা কোনো রকম প্রতিবাদ করতে পারতোনা। এই ধরনের সমস্যার সমাধান কল্পেই এই আইনের প্রয়োজন দেখা দিল। আইনের ৩নং ধারায় বলা হয়েছে যে, কোনো কাজ বা আচরণ করা বা না করার জন্য সংশ্লিষ্ট মহিলার ক্ষতি হলে বা আঘাত লাগলে কিংবা ক্ষতি হওয়া বা আঘাত লাগার সম্ভাবনা থাকলে তাকে 'পারিবারিক নির্যাতন' বলে ধরা হবে। এই আইনে শারীরিক, যৌন, আবেগ গত, মৌখিক, মানসিক ও অর্থনৈতিক নির্যাতন বা এগুলির ভয় দেখানোকেও অপরাধ বলে গণ্য করা হয়েছে। মামলা চলাকালীন স্ত্রীর কোনো রকম অধিকার স্বামী খর্ব করতে পারবে না। স্ত্রী ঐ একই বাড়িতে বসবাস করতে পারবে। প্রোটেকশন অফিসারের সাহায্য নিতে পারবেন স্ত্রী। একই সঙ্গে নির্যাতিতা ভারতীয় দন্ডবিধির ৪৯৮ এ ধারাতেও অভিযোগ জানাতে পারবেন। সামান্য কিছু ক্ষেত্রে এই আইনের অপব্যবহারের

Scanned with CamScanner

অভিযোগ উঠলেও সাধারণ ভাবে এই আইন ভারতীয় নারীদের সুরক্ষার অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে পরিগণিত হয়েছে।

দলিত-নারী আন্দোলন

১৯৯০-এর দশকের মাঝামাঝি ভারতবর্ষে দলিত নারী আন্দোলন খুব শক্তিশালী হয়ে ওঠে। যদিও দলিত-নারীরা বিভিন্ন আন্দোলনে অনেক আগে থেকেই ভূমিকা পালন করেছিল। দলিত সমাজের অভ্যন্তরে পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অনলস ছিলেন ড. বি. আর. আম্বেদকর। জাত-পাত, অস্পৃশ্যতা ও নারী অবদমনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নারীদের অংশগ্রহণ করার বিষয়টাও তাঁর কাছে ছিল সমান গুরুত্বপূর্ণ। ১৯২৭ সালের মাহার সত্যাগ্রহের সময় থেকেই ড. আম্বেদকর নারীদের উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে তাঁদের জন্য পৃথক সভার আয়োজন করতেন। এই ধরণের সভাগুলি থেকে একদল মহিলা নেত্রী ও সংগঠক গড়ে ওঠেন। এর ফলে মাহারে এক ধরণের মহিলা মন্ডল আন্দোলনেরও সূচনা হয়। ১৯৩০ সালে তাঁর শুরু করা 'জনতা পত্রিকার' পরিচালন সমিতিতে সাবিত্রীবাই বোরদে ও অম্বুবাই গায়কোয়ার নামে দুইজন মহিলা নিযুক্ত হন। ১৯৪৮ সালে বোম্বাইয়ের সিদ্ধার্থ কলেজে একটি সভায় মহিলারা আম্বেদকরের ত্রি-নীতিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে পৃথকভাবে দলিত মহিলা সংগঠনের মাধ্যমে 'শিক্ষিত কর, বিক্ষুব্ধ কর এবং সংগঠিত কর' প্রচারের আবশ্যকতা তুলে ধরেন। আম্বেদকরের আন্দোলন পরবর্তী কালে দলিত-নারীদের উন্নততর চেতনা ও আত্মমর্যাদাবোধের ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে। এরই ফলশ্রুতি ১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠিত দি ন্যাশনাল ফেডারেশন অফ দলিত উইমেন' (NFDW,1995)। এই সংগঠন ভারতের নারী আন্দোলনে উচুঁজাতের হিন্দু প্রাধাণ্যের বিরোধিতা শুরু করে। ১৯৯৬ সালের আইন সভায় নারী সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিল এ দলিত মহিলাদের আলাদা সংরক্ষনেরও দাবি তোলে। এই বিষয়টা আরও স্পষ্ট হয়ে যায় যে ভারতে 'ভারতীয় নারী' বলে কোনো 'সমজাতীয় বর্গ' (homogenous category) কোনো আলাদা অর্থ বহন করে না।

দলিত- নারীবাদী বক্তব্যে দলিত নারীদের ক্ষেত্রে তিন ধরনের অবদমনকে চিহ্নিত করা হয় :(১) উচুঁ জাত দ্বারা অবদমন (২) উঁচু শ্রেণি দ্বারা অবদমন এবং (৩) নিজ জাতের পিতৃতন্ত্র দ্বারা অবদমন। এই সব অবদমনের বিরুদ্ধে দলিত-নারী আন্দোলনের অভিমুখ সূচিত হয়। উত্তর প্রদেশের দলিত মহিলা সমিতির (DMS) মতো সংগঠন বিভিন্ন জায়গায় গড়ে ওঠে। দলিত -নারীদের পরিচিতি-সত্তার ভিত্তিতে তারা আন্দোলন গড়ে তোলে। দলিত- নারী হিসেবে আলাদা রাজনৈতিক পরিসরের দাবিতে তারা সোচ্চার হয়ে ওঠে।

খাপ-পঞ্চায়েত বিরোধী নারী আন্দোলন

১৯৯৫ সালে হরিয়ানার জিন্দ জেলায় এক যুবক খাপ-পঞ্চায়েত-এর নির্দেশ অমান্য

করে গ্রামেরই একটি মেয়েকে বিয়ে করে। শাস্তি হিসেবে খাপ পঞ্চায়তের মাতব্বররা যুবকটির বারো বছর বয়সী বোনকে ধর্ষন করার বিধান দেয়। এই নারকীয় সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে সমাজকর্মী জগমতি সাংওয়ানের নেতৃত্বে অঞ্চলের প্রায় হাজার মহিলা প্রতিবাদ আন্দোলন শুরু করে। এদের মধ্যে অনেক মহিলা ছিল যারা এই নারকীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের স্ত্রী। কন্যা ভ্রুণ হত্যা, সম্মান রক্ষার্থে হত্যা, প্রভৃতি খাপ-পঞ্চায়েতের বিভিন্ন নারী বিরোধী কাজকর্মের বিরুদ্ধে এই আন্দোলন আরও ব্যাপকতা লাভ করে। জগমতি সাংওয়ান প্রতিষ্ঠিত জনবাদী মহিলা সমিতিতে প্রায় পঞ্চাশ হাজার মহিলা যুক্ত হয়। হরিয়ানাতে খাপ-পঞ্চায়েত বিরোধী নারী আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে।

মাদক বিরোধী নারী-আন্দোলন

১৯৯০-এর দশকে অন্ধ্র প্রদেশ-এর গ্রামাঞ্চলে মহিলারা নিজেরাই মাদক-বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলে। মাদকাসক্তিকেই তারা পরিবারের বিপর্যয় এবং নারীর উপর নির্যাতনের মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করে। তাদের একটাই দাবি ছিল গ্রামে মদ পান করা এবং বিক্রি করা চলবে না। সন্ধ্যা নামের এক মহিলার নেতৃত্বে প্রথমে তারা জেলা সমাহর্তার অফিসে ধর্নায় বসে। ধর্নার পাশাপাশি মহিলারা গ্রামে মদের দোকান ভাঙ্গা শুরু করে। গ্রামে মহিলারা মিছিল করে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে রক্তে লেখা স্মারকলিপি জমা দেয়। এতে যথেষ্ট ফল না পাওয়ায় তারা আবার গ্রাম ভিত্তিক চরমপন্থী আন্দোলন শুরু করে। গ্রামের মহিলাদের এই মাদক বিরোধী আন্দোলনের ফলে শেষ পর্যন্ত ১৯৯৫ সালে রাজ্যব্যাপী মাদক সেবন নিষিদ্ধ ঘোষনা করা হয়। এই আন্দোলনের অনন্যতা সম্পর্কে উল্লেখ করে সমাজবিজ্ঞানী কঞ্চা ইলাইয়া মন্তব্য করেছেন, এই নারী আন্দোলনের পদ্ধতি না গান্ধীবাদী না মার্কসবাদী, এই নারী আন্দোলন এক অনন্যতার উদাহরণ।

এই প্রসঙ্গে উত্তর প্রদেশের বাদাউসাতে চরমপন্থী গুলাবী গ্যাং (pink gang) নারী আন্দোলনের কথা উল্লেখ করা যায়। ২০০২ সালে সুমন সিং চৌহানের নেতৃত্বে এই আন্দোলন সংঘটিত হয়। বাদাউসা ভারতবর্ষের অন্যতম দরিদ্রতম জেলা। নিরক্ষরতা, জাত-পাত এবং নারী-নির্যাতন এখানে ছিল স্বাভাবিক ঘটনা। এর বিরুদ্ধে গ্রামের বৌরাও ঐক্যবদ্ধ হয়। নির্যাতনের কোনো ঘটনা কানে এলেই তাঁরা দলবদ্ধভাবে লাঠি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ত। তাঁরা গোলাপী শাড়ি পড়ত। তাই নাম গুলাবী গ্যাং। এরা ছিল দলিত নারী। পুলিশ -প্রশাসনের উপর আস্থা না থাকায় তারা আইন হাতে তুলে নিত। হিংসার বিরুদ্ধে হিংসার এই পথ গ্রামে নারী -নির্যাতন অনেকটাই কমিয়েছিল বলে কেউ কেউ অভিমত প্রকাশ করেন।

নারী-আন্দোলনের এন.জি.ও -করণ—

Scanned with CamScanner

১৯৯০-এর শেষার্ধে ভারতবর্ষের নারী আন্দোলনে অসরকারী-সংগঠন গুলির (NGO) ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এই সংগঠন গুলি তাদের নারী উন্নয়ন কর্মসূচিগুলি পরিচালনার জন্য সরকার এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির কাছ থেকে অনুদান নিতে শুরু করে। কারো কারো মতে, এর ফলে আন্দোলনের সক্রিয়তার মধ্যে পেশাদারিত্বের প্রবেশ ঘটে। স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলির কর্মসূচি রূপায়নে একধরণের দাতা-গ্রহীতা সম্পর্কের উদ্ভব ঘটে।

আবার অনেকে মনে করেন, এন. জি. ও-গুলির কিছু প্রয়াস যথেষ্ট গতিশীল। সেগুলি নারী-ক্ষমতায়নে সহায়ক শক্তি হিসেবে ভূমিকা পালন করছে। এর প্রভাব দরিদ্র এবং প্রান্তিক নারীদের জীবনেও পৌঁছেছে। এরা অনেকেই এতকাল সামাজিক বহিস্করণ (social exclusion) এর শিকার হয়েছিলেন।

উপসংহার

অধিকাংশ সমাজবিজ্ঞানী এই বিষয়ে একমত যে ১৯৭০ এবং ১৯৮০-এর দশকগুলিতে বিভিন্ন ধরণের আন্দোলন গুলিতে সক্রিয় কর্মি হিসেবে নারীর সংখ্যা যথেষ্টই বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে কৃষক আন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলন, আদিবাসী আন্দোলন, দলিত আন্দোলনে নারীর উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো। তবে এ-প্রসঙ্গে গেল ওমভেট'র পর্যবেক্ষণ উল্লেখযোগ্য। তাঁর মতে, এই আন্দোলন গুলিতে শ্রেণি অথবা সামাজিক ইস্যুগুলি যেভাবে প্রধান্য পেয়েছে নারীদের নিজস্ব ইস্যুগুলি সেভাবে পায়নি। তাই তিনি নারী-আন্দোলনের প্রেক্ষিতে এই আন্দোলনগুলিকে 'প্রাক-আন্দোলন' (pre-movements) হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। ওমভেট মনে করেন, এই আন্দোলনগুলির মধ্য দিয়ে নারী-শক্তির সম্ভাবনা স্পষ্ট হয়েছে এবং তা ভবিষ্যতের শক্তিশালী নারী আন্দোলনের প্রস্তুতি পর্ব হিসেবে ভূমিকা পালন করেছে।

কোনো কোনো সমালোচক মনে করেন, ভারতবর্ষে যে কটি উল্লেখযোগ্য নারী অন্দোলন সংঘটিত হয়েছে বৈশিষ্ট্যগত ভাবে তা ছিল পাশ্চাত্য প্রভাবিত, উচ্চ বর্গীয় এবং শহুরে। সমান কাজের সুযোগ, সমান মজুরীর মতো নিম্নবর্গের নারীদের ইস্যুগুলি এই সব আন্দোলনে গুরুত্ব পায়নি। আন্দোলনগুলিতে উদ্যোগ ও সমন্বয়ের অভাবও পরিলক্ষিত হয়। এর ফলে আন্দোলনগুলি আশানুরূপ স্থায়িত্ব লাভ করতে পারেনি।

কমলা ভাসিন মনে করেন, ভারতে নারী আন্দোলনের প্রবল চাপে, সুশীল সমাজ ও সরকারের তৎপরতায় নারীদের জন্য বেশ কিছু সদর্থক পরিবর্তন হয়েছে। লিঙ্গ সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে সমাজে নারী অবদমনের বিষয়টা স্বীকৃতি পেয়েছে। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের প্রয়োজনটাও অনেকেই মেনে নিয়েছেন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সিদ্ধান্ত নেবার প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণের প্রয়োজন এখন অনেকটাই অনুভূত হচ্ছে। নারীদের জন্য আইনি ব্যবস্থা,

Scanned with CamScanner

শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বেড়েছে। সরকারি -বেসরকারি উন্নয়ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। পঞ্চায়েত ও পৌরসভায় অনেক বেশি মহিলা নির্বাচিত প্রতিনিধি হবার সুযোগ পাচ্ছে। নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করছে। বিশেষ করে মহিলাদের জন্যই সরকার বিভিন্ন কমিশন, দপ্তর, মন্ত্রক গড়ে তুলেছে। কমলা ভাসিন মনে করেন এতসব হওয়া সত্ত্বেও নারীর সমানাধিকারের কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছতে এখনও দীর্ঘপথ পাড়ি দিতে হবে।

বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায়, ভারতের সব শ্রেণি, জাত,ধর্ম, গোষ্ঠীতে নারীর ঠাঁই নীচে। অধিকাংশ নারী পিতৃতান্ত্রিক কাঠামো ও ধ্যান ধারণার ভুক্তভোগী। দমন-পীড়নের শিকার। সমাজ ও মানব উন্নয়নের সূচকগুলিতে পুরুষের চেয়ে তারা অনেকটাই পিছিয়ে। লিঙ্গ-অনুপাতে, সাক্ষরতার হারে, স্বাস্থ্য-পুষ্টি-শিক্ষাতে, আয়ুষ্কালে-সবদিক দিয়েই নারীরা পুরুষদের চেয়ে অনেকটাই পিছিয়ে। অধিকাংশ নারী কম দক্ষতা এবং কম পারিশ্রমিকের কাজকর্মে যুক্ত। অনেকেই গৃহে পারিশ্রমিকহীন কাজ করে জীবন অতিবাহিত করছে। বিষয় সম্পত্তির মালিকানায় তাদের অধিকার নেই বললেই চলে।

রাজনৈতিক-সামাজিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীদের অংশগ্রহণ খুব কম। ৭৩ এবং৭৪ তম সংবিধান সংশোধনে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনে মহিলা প্রতিনিধির সংখ্যা আইনগতভাবে সংরক্ষিত হলেও সংসদে মহিলা সংরক্ষণ বিল (৮১ তম সংবিধান সংশোধন বিল ১৯৯৬) এখনো পাস করা যায়নি। মহিলা সাংসদের সংখ্যা এ যাবৎকাল দশ শতাংশের মধ্যেই থেকেছে।

দৈনিক পত্রিকার পাতায় কিংবা টিভির খবরে প্রায় প্রতিদিন যৌন নির্যাতন, পণের জন্য মৃত্যু, অ্যাসিড হামলা, ধর্ষণ, নারী- পাচারের ঘটনা, ভ্রূণ-হত্যা, বধূ মৃত্যুর মতো ঘটনা একটুও কমেনি।

সামগ্রিকভাবে বলা যায়, ভারতবর্ষের নারীদের জীবন-পরিস্থিতির সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে পরিবর্তনহীনতা ও পরিবর্তনের দ্বান্দ্বিকতা সমাজ গবেষকদের দৃষ্টি গোচর হয়। ভারতীয় সমাজে নারীর সমানাধিকারের লক্ষ্যে নারী আন্দোলনের মূল অভিমুখ হওয়া উচিত পিতৃতান্ত্রিক সংস্কৃতির পরিবর্তন। ভারতবর্ষে নারী-পুরুষের সামাজিকীকরণের মধ্যে লিঙ্গ বৈষম্য শিকড় গেড়ে আছে। প্রকৃত নারী-আন্দোলনের লক্ষ্য হবে নিরন্তর সচেতনতার প্রচার ও বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে ভারতীয় সমাজে লিঙ্গ সাম্যের মূল্যবোধ প্রবিষ্ট করানো। লিঙ্গ সাম্যের সংস্কৃতিকে বাদ দিয়ে নারীবিকাশের লক্ষ্যে কোন রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টাই দীর্ঘস্থায়ী সাফল্য এনে দিতে পারবে না। এই পরিপ্রেক্ষিতেই অধ্যাপক অমর্ত্য সেন মন্তব্য করেছেন নারীমুক্তি আন্দোলন শুধুমাত্র নারীদের বিষয় নয়, তা পুরো সমাজের প্রগতি আন্দোলনের অংশ। কারণ দেশের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক অংশ নারীদের অবদমিত রেখে কোনো দেশ বা জাতির প্রকৃত বিকাশ সম্ভব নয়।

Scanned with CamScanner